

# বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি: সরকারি উৎপীড়ন ও শিক্ষার্থী সক্রিয়তার নামা রূপ

আনু মুহাম্মদ

এই প্রবন্ধে স্বাধীনতার আগে থেকে এইসময় পর্যন্ত সামগ্রিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতির ভেতরের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থনীতির গতিমুখের সাথে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, শাসকগোষ্ঠীর সংকট ও সহিংসতা, উৎপীড়নমূলক রাজনীতি এবং গণতন্ত্রের ভঙ্গুরতার পাশাপাশি জনপ্রতিরোধে তরফদের নামামুখি তৎপরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। সরকারি প্রস্তরোষকতায় ক্রমে বেড়ে চলা সন্ত্রাসী পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার নামা রূপ ও সম্ভাবনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখানে ছাত্র রাজনীতি বলতে বোঝানো হয়েছে সকল শিক্ষার্থী বা ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন।

## ভূমিকা

স্বাধীনতার পর থেকে, বিশেষকরে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে তা একটি বহুল প্রচারিত বিশ্বাস। প্রায়ই বলা হয় যে এখন ছাত্র রাজনীতি টাকা-পয়সা ও ক্ষমতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, স্বাধীনতার আগে যা ছিল দেশপ্রেম আর আদর্শের সাথে সম্পর্কিত। এরকম সূত্রায়ন ঠিক নয়। আমার মতে এ ধরনের সরল যুক্তির চেয়ে আসল পরিস্থিতি বরং আরও অনেক জটিল।

বস্তুত ছাত্র রাজনীতিকে গড়ে বা সাধারণভাবে ‘ভাল’ বা ‘খারাপ’ বলা যায় না, কারণ এই পরিচয়ের কার্যক্রম কখনোই সমজাতীয় হয় না (আর হতে পারে না)। একটি দল আদর্শিকভাবে বা তার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, এবং তাদের রাজনৈতিক মেরুকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ধরনের কারণে অন্য আরেকটি দলের চেয়ে অন্যরকম ভূমিকা নিয়ে থাকে। কাজেই ছাত্র রাজনীতিকে একটি অবিভক্ত সন্তুষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। এটি হতে পারে জনপছ্টী (pro-people) বা জন-বিরোধী (anti-people), এটি হতে পারে শোষণের হাতিয়ার, অথবা হতে পারে স্বাধীনতা ও যুক্তির জন্য জনগণের লড়াইয়ের অংশ। কার ভূমিকা কী দাঁড়াবে তা নির্ভর করে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী কী ধরনের রাজনৈতিক, শ্রেণী বা সামাজিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে তার ওপর।

ইতিহাস পর্যালোচনায় পরিষ্কার দেখা যায় যে, ছাত্র সংগঠনের সহিংস আচরণ, বা সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর রাষ্ট্র-সমর্থিত সহিংসতা পাকিস্তানের সামরিক শাসনের সময় থেকে শুরু হয়েছে। তখন থেকে কোনো ব্যক্তিক্রম ছাড়াই আমরা দেখি ক্ষমতাসীন দলের সশস্ত্র ও সহিংস ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের ক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়। দুঃখজনকভাবে এই প্রবণতা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও থেমে যায় নি, বরং প্রত্যেক সরকারের আমলে আগের চেয়ে আরও বেড়েছে। কাজেই শিক্ষাসন্ধি ছাত্র রাজনীতির সন্ত্রাস প্রকৃতপক্ষে সকল ছাত্র সংগঠনের বৈশিষ্ট্য নয়, তা প্রধানত ‘শাসক দলের ছাত্র সংগঠন’ বা আরপিএসও (ruling party student organisation- RPSO) প্রবণতা। ঘটনাক্রম দেখলে এটি স্পষ্ট হয় যে, সরকারি ছাত্র সংগঠন সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পেশীশক্তি হিসেবেই কাজ করে।

## রাজনৈতিক সময়বিন্যাস: গণতন্ত্রের ভঙ্গুরতা

বাংলাদেশ তার অর্থনীতি, প্রশাসন, আইনি ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো পাকিস্তানের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিল, তবে নতুন দেশে একটি নতুন উন্নয়ন দর্শন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গঠন করা ছিল একটি যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশার বিষয়। স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ লড়াই ও ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এটি অস্বাভাবিক ছিল না যে

নতুন দেশটি দ্রুত ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজের গণতন্ত্রায়ণের জন্য উচ্চ প্রত্যাশার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু তা ঘটেনি। স্বাধীনতার পরের চার দশকে বাংলাদেশ অনেক ধরনের সরকার প্রত্যক্ষ করেছে: সামরিক ও বেসামরিক, সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত, নির্বাচিত ও অনির্বাচিত। তিনবার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে (১৯৭৪, ১৯৮৭ ও ২০০৭ সালে), আর সামরিক আইন জারি করা হয়েছে দুইবার (১৯৭৫ ও ১৯৮২ সালে)। এই ৪০ বছরে দুইজন রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হয়েছে (১৯৭৫, ১৯৮১ সালে)। ১৯৯১ সালে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রচলন ঘটানো হয়; এই ব্যবস্থা আবার সংবিধানের ১৫তম সংশোধনের পর বাতিল করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের মানুষ ভোটারবিহীন/প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে ক্ষমতায় আসতে দেখেছে তিনবার (১৯৮৮, ১৯৯৬ ও ২০১৪ সালে)।

এই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সংবিধানে বর্ণিত অনেক অঙ্গীকার ক্রমে বাগাড়মৰে পর্যবসিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সংবিধানে যেখানে বলা হয়েছে “রাষ্ট্র কোনো নাগরিককেই ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য করবে না”, সেখানে বৈষম্যমূলক আইন বহাল রয়েছে এবং ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য এ ধরনের আরও আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, বৈষম্য বাড়ছেই। সংবিধানে বর্ণিত সব নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার থেকে দেশ অনেক দূরে সরে গেছে। প্রকৃত অর্থনৈতিক, আইনগত ও রাজনৈতিক নীতি এসব অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, পরাজিত করেছে আর শেষ পর্যন্ত এসব অঙ্গীকারকে হিমাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে।

১৯৭৩ সাল থেকে বাংলাদেশ সংবিধান অনেকগুলো সংশোধনের মধ্য দিয়ে গেছে যা একে ত্রুটাগত আরও অগণতাত্ত্বিক ও সাম্প্রদায়িক করে তুলেছে। সর্বশেষ সংশোধনীতে সব নাগরিককে বাঙালী হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসমূহের অস্তিত্ব অঙ্গীকারধারা পোক করা হয়েছে। জনগণের নামেই বিভিন্ন সময় এসব সংশোধনী করা হয়েছে, কিন্তু সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী পর্যালোচনা করে এসবের পেছনে কোনো জনমতের চাপ লক্ষ করা যায় না। এসব সংশোধনীর সময়কাল ও পরবর্তী ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে বরং তিনটি বিষয় লক্ষ করা যায়: (১) সংবিধানের যেসব বড় সংশোধনী ঘটানো হয়েছে তার কোনোটাই জনগণের দাবি ছিলো না (যেমন, একদলীয় শাসনব্যবস্থা, দায়মুক্তি আইন (indemnity law), সামরিক শাসন ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আইনি অনুমোদন, যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনুমোদন, রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন, অন্যান্য জাতি অঙ্গীকার, ইতিহাস পাঠে সরকারি ভাষ্য বাধ্যতামূলক করণ ইত্যাদি); (২) এসব সংশোধনের অনেকগুলো এমন অনির্বাচিত সরকারের দ্বারা

প্রণীত যারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল আর পরবর্তী সময়ে বৈধতা পেয়েছিল; এবং (৩) কোনো নিপীড়নমূলক বা বৈষম্যমূলক সংশোধনী পরবর্তী কোনো সরকার বাতিল করেনি।

একের পর এক ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ক্রমাগত নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ঝুঁকিপূর্ণ করেছে আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও দলীয় স্বার্থের অধীনস্থ করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সম্পদ আর ক্ষমতা সঞ্চয় নির্বিঘ্ন করতে একের পর এক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করেছে।

দেশের প্রাণিক অবস্থান ও সরকারসমূহের ভূমিকা বৈশ্বিক ও স্থানীয় বড় করপোরেট গোষ্ঠীগুলোকে দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার বিপুল ক্ষমতা দিয়েছে। তাই পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, দেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাথে সব বড় বড় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে বাংলাদেশী জনগণের সম্মতি বা তাদের অবগতির বাইরে।

১৯৯০ সালে স্বৈরতন্ত্রিক সামরিক সরকারের পতনের পর থেকে, কিছু বিরতি দিয়ে, একের পর এক তথাকথিত ‘নির্বাচিত’ সরকারই দেশের পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। এসব নির্বাচন কখনোই পেশীশক্তি বা অর্থের ক্ষমতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি, সংসদকে কখনোই জনগণের প্রতিনিধিদের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে দেওয়া হয় নি, আর এই ‘নির্বাচিত’ প্রতিষ্ঠানকে খুব কমই দেশের নিয়ন্তি নির্ধারণ করে এমন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি তৈরি এমনকি সেসব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে ক্ষমতাবান গোষ্ঠীগুলো প্রতিষ্ঠান ও আইনের উর্ধ্বে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও নব্য-উদারনৈতিক নীতি গড়ফাদার ও মাফিয়া নেতাদের জন্য চরম কর্তৃত্বের পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। একদিকে রাষ্ট্র দেশি-বিদেশি গোষ্ঠী দ্বারা তৈরি বিভিন্ন উন্নয়ন পথই শিরোধার্য করেছে, অন্যদিকে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে রাষ্ট্র তার জনগণের ওপর চরম নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা জারি রাখছে। এসবের মধ্য দিয়ে ভঙ্গুর গণতন্ত্রের জায়গা নিয়েছে দানব-তত্ত্ব (demon-cracy)।

### উন্নয়নের গতিপথ এবং মধ্যবিত্ত

স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের সমাজ ছিলো প্রধানত স্কুদ্র ও মাঝারি আয়ের জনগোষ্ঠীদের, স্কুদ্র ব্যবসায়ী, নিম্ন ও মধ্য আয়ের পেশাজীবী, স্কুদ্র ও মাঝারি কৃষক, এবং স্কুদ্র উদ্যোক্তা। গ্রামীণ এলাকায় বড় কৃষক ও জোতদাররা থাকলেও শিল্প বা বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল সম্পদশালী শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রায় ছিলই না। গত তিনদশকে সেই সামাজিক কাঠামো বদলে গেছে। পুঁজি সঞ্চয় প্রক্রিয়ার কারণে এখন হাজার হাজার সম্পদশালী কোটিপতি দেখা যায়।

অন্যান্য অনেক প্রান্তস্থ পুঁজিবাদী দেশের মতোই বাংলাদেশকেও ১৯৮০'র দশকের শুরুর দিকে “ওয়াশিংটন ঐকমত্যের” (ডব্লিউসি) সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমের জন্য কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির (এসএপি) অধীনে নিয়ে আসা হয়। এসব কার্যক্রমের মধ্যে সর্বজনখাতে ব্যয় সংকোচন, বাণিজ্য ও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) উন্নুক্তকরণ, পুঁজির পক্ষে বেসরকারিকরণ ও নিয়ন্ত্রণহীনকরণের (deregulation) অনেক উপাদান ছিল। এসব

কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল সকল মানবিক প্রয়োজন ও তৎপরতাকে মুনাফাভিত্তিক তৎপরতায় পরিণত করা এবং করপোরেট স্বার্থের জন্য উন্নুক্ত করার মাধ্যমে সবকিছুকে ব্যক্তিখাতের আওতায় নিয়ে আসা। এটি সার্বিকভাবে নব্য-উদারনৈতিক অর্থনৈতিক নীতি হিসেবে পরিচিত।

এই তথাকথিত নব্য-উদারনৈতিক মডেলের অধীনে এসব অর্থনৈতিক সংস্কার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনেক উত্থান-পতন নিয়ে আসে। বড় বড় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলা হয়; যেসব জমিতে বড় বড় কারখানা ছিল সেখানে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, শপিং মল আর আবাসন এলাকা (real estate) গড়ে তোলা হয়। রপ্তানিমুখি তৈরি পোশাক কারখানা শিল্পায়নের প্রধান অবলম্বনে পরিণত হয়।<sup>১</sup> কারখানার স্থায়ী চাকরির জায়গা নেয় অস্থায়ী, খন্দকালীন কাজ। বহু কাজ বাইরে চুক্তি ভিত্তিতে কমদামে করানো (outsourced) হয়, কাজের অনিশ্চয়তাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে এই সময়ে অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো অর্থ অর্থনীতির জীবনরেখায় পরিণত হয়। জুলানির উৎস আর বিদ্যুৎ খাতকে ধীরে ধীরে ব্যক্তিপুঁজি খাতে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলাফল হিসাবে গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ার সাথে সাথে উৎপাদনশীল খাতের ব্যয়ও বেড়ে যায়। এছাড়াও ভুল নীতি আর দুর্নীতির কারণে বিদ্যুৎ খাতের নিরাপত্তা হ্রাসকর মুখে পড়ে। ভূমিদখল, বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় সম্পদ দখল আর বনাঞ্চল উজাড়ের ফলে অনেকে বাস্তুচ্যুত হয়।<sup>২</sup>

এর সাথে সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগত তিনদশকে অবৈধ, গোপন, অপ্রকাশিত ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডের আকার ও হার অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে গেছে। ঘূষ, খারাপ প্রকল্প অনুমোদনের বিনিয়োগে প্রাণ কমিশন, উন্নয়ন প্রকল্প থেকে চুইয়ে আসা অর্থ, অপরাধ, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা, দুর্নীতি, দখল, মানব পাচার, যৌন ব্যবসা, প্রতারণা আর প্রবৃত্তিগুলুক কর্মকান্ডের সাথে সাথে এই অর্থনীতির আকার ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

অন্যান্য জায়গার মতো বাংলাদেশেও ‘নব্য-উদারনৈতিক’ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয় দুর্নীতি হাস, দক্ষতা ও স্বচ্ছতার উন্নয়ন ঘটানো, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হাসের যুক্তি দিয়ে। কিন্তু পরিবর্তে এসব সংস্কার দুর্নীতির আওতা ও বৈধতা, অপরাধ-প্রবণতা, সম্পদ দখল, খারাপ চুক্তি থেকে কমিশন, আর বলপ্রয়োগ বাড়িয়েছে। পুঁজি সংগ্রহের এই প্রক্রিয়া ইউরোপে প্রাথমিক পর্যায়ে পুঁজি সঞ্চয়ের ওপর কার্ল মার্সের বর্ণনার সাথে মিলে যায়, যেখানে পুরানো ও নতুন অভিজাত গোষ্ঠী সর্বজনের সম্পদ কুক্ষিগত করে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে। আর ডেভিড হার্টের মতে যেটি “উচ্চদের মাধ্যমে সম্পদ কুক্ষিগত করা”<sup>৩</sup> হিসেবে এখনও অব্যাহত আছে। পার্থক্য এটাই যে, ইউরোপে এটা ঘটেছিলো উপনিবেশগুলোতে, বাংলাদেশে এটা ঘটেছে নিজদেশেই।

এ ধরনের দুর্বল তৎপরতা যে রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত তা সহজবোধ্য। সরকারি ভূমি ও সম্পদ দখল আর দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদ আহরণের সুযোগ সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে যে কমে না - বরং বাড়ে, তার যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের সাথে

সংশ্লিষ্ট ছাত্র-কর্মীরা এসব সুযোগের সম্ভবহার করার ক্ষেত্রে তাদের সমসাময়িক শিক্ষার্থীদের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। সফল ছাত্রনেতৃত্ব প্ররবর্তী জীবনে যে কোটিপতি হিসেবে আবির্ভূত হয় তা তাই কোনো বিস্ময়কর বিষয় নয়।

অর্থনীতির প্রকৃতি ও গতিমুখ নির্দেশ করে বিভিন্ন খাতের উত্থান ও পতনের সারাংশ সারণি ১-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

#### সারণি ১: ‘উন্নয়ন’ প্রক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশে উত্থান ও পতনের চিত্র

উচ্চ প্রকৃতির ক্ষেত্র	সংকটাপন্ন এবং/অথবা ক্রমসমান
সুপার মার্কেট	উৎপাদনকারী কারখানা
গাড়ির দোকান	যন্ত্রচালিত কারখানা
উচ্চফলনশীল বীজ, যন্ত্রের ব্যবহার	স্থানীয় বীজ (local variety), জীব-বৈচিত্র্য
পানিসম্পদ প্রকল্প	নিরাপদ পানি, জলাশয়
উচ্চ ভবন	সাধারণ আবাসন
এনজিও ও প্রকল্প	স্থানীয়/ জাতীয় উদ্যোগ
সেবা খাত, তেল, গ্যাস খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ	টেকসই উৎপাদনে বৈদেশিক বিনিয়োগ
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	পাঠাগার ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান
বাণিজ্যিক ও ব্যয়বহুল কোচিং সেন্টার ও মাদ্রাসাসহ বেসরকারি ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	সর্বজনের বিদ্যালয়/ কলেজ/ বিশ্ববিদ্যালয়
অনানুষ্ঠানিক খাত ও অস্থায়ী কাজ	টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ
শহরে জনসংখ্যা	প্রকৃত আয়/ বেতন
কর্মজীবী নারী	নারীর আয়/ বেতন/ নিরাপত্তা
ব্যয়বহুল বেসরকারি ক্লিনিক, রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র	সর্বজনের স্বাস্থ্যসেবা
ডিগ্রিধারী মানুষ	বিজ্ঞানী, সামাজিক বিজ্ঞানী, চিকিৎসক
অপরাধ	নিরাপত্তা
গ্রাম থেকে শহরে ও দেশের বাইরে অভিবাসন	মানুষ ও বস্ত্রগত সম্পদের দক্ষ ব্যবহার
যোগাযোগ প্রযুক্তি	সাধারণ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি
ভোগবাদিতা	স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য
পরামর্শজীবীতা (consultancy)	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে স্বাধীন গবেষণা
অপরাধমূলক ও গোপন ('কালো') অর্থনীতি	উৎপাদনশীল ও টেকসই উদ্যোগ

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশী মধ্যবিত্তের বিস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই মধ্যবিত্তের একটি অংশের বেড়ে যাওয়া স্বচ্ছতার সাথে বেশিরভাগ সামাজিক পরিষেবার ব্যক্তিখাতে চলে যাওয়া, বৈদেশিক ঝণনির্ভর প্রকল্প আর উপরি আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি সরাসরি সম্পর্কিত। নিজেদের সামাজিক অবস্থান ধরে রাখা আর উচ্চতর আয়ের শ্রেণীতে যাওয়ার সিঁড়ি খুঁজে পাওয়ার জন্য মধ্যবিত্তের বিকল্পগুলো সম্পদ কুক্ষিগত করার প্রধান উপায়গুলোর সাথে নানাভাবে সম্পর্কিত। শিক্ষক ও চিকিৎসকদের উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার বেসরকারিকরণের মাধ্যমে অধিক অর্থ উপার্জনের রাস্তা পেয়েছে। তরুণসমাজ এখন কর্মসংস্থানের জন্য প্রধানত বাণিজ্যিক সেবা খাত বা অন্যান্য কর্পোরেট খাতের ওপর নির্ভর করে। কাজেই এটি বিস্ময়কর নয় যে মধ্যবিত্ত সাধারণভাবে দখলকারী, দুর্নীতিবাজ আর রাষ্ট্রে নব্য-উদারনৈতিক কার্যক্রমের প্রতি এখন অনেকবেশি সহনশীল, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমর্থকে পরিণত হয়েছে।

এই সময়কালে বাংলাদেশে অনেক নতুন পেশার উন্নত ঘটেছে, যেগুলোর বেশিরভাগই সরাসরি বা ভিন্নভাবে ব্যক্তি পুঁজি কেন্দ্রিক সেবা খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদিও নতুন পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে অংশের আয় বেশি, কিন্তু বেশিরভাগ নতুন পেশা অনানুষ্ঠানিক, অস্থায়ী আর কম

বেতনের। ঢাকা শহরের পেশার ওপর একটি জরিপে অনেক নতুন পেশা তালিকাভুক্ত করা হয় যেগুলোর বেশিরভাগই সেবাকেন্দ্রিক আর অনেক বুঁকিপূর্ণ। অস্থায়ী, কম আয়ের ও অনিরাপদ কর্মসংস্থান হচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে আসা জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশের অনিবার্য ভবিতব্য। অনানুষ্ঠানিক খাতের দ্রুত বেড়ে উঠার সাথে ভাসমান শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে যাদের মজুরি শিল্প-কারখানায় কাজ করা শ্রমিকের কম মজুরির চেয়েও অনেক কম।<sup>৪</sup> বেশি-আয়ের কাজ রয়েছে প্রধানত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি ব্যাংক, এনজিও, পরামর্শক প্রতিষ্ঠান, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান ও বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চপদের কাজগুলোতে।

এসব নতুন বিকশিত বেশিরভাগ ব্যবসা গোষ্ঠী ক্ষমতাসীমান দল এবং মাঠ পর্যায়ে এর ছাত্র ও যুব সংগঠনের সমর্থনের ওপর অনেক বেশি নির্ভর করে, যেন ব্যবসা মসৃণভাবে চলে আর বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন প্রক্রিয়ায় সহজে ঢোকা যায়।

**ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন পর্ব ও নানা শ্রেত**  
সর্বজন বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সবসময়ই ছিল ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্রে। স্বাধীনতার সময় দেশে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল: চারটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) আর দুটি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)। ১৯৯০-এর দশকের আগে দেশে কোনো প্রাইভেট বা বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল না। ১৯৯০-এর দশকের শুরু থেকে উচ্চশিক্ষাকে বেসরকারি খাতে নিয়ে যাওয়ার নীতির কারণে

বর্তমান দশক শুরুর সময় বাংলাদেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৪টি, এখন তা ৬০টির বেশি, আর নিবন্ধনের অপেক্ষায় আরও অনেকগুলো। তবে এখনও ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্র সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়েই। তবে প্রাইভেট বা বাণিজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ছাত্র রাজনীতি না থাকলেও সম্প্রতি ভ্যাট, বেতন বৃদ্ধি, যৌন নিপীড়ন নিয়ে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী বিক্ষেপ আন্দোলনের ঘটেছে।

#### ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্বাস: পাকিস্তান আমল

১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান ও গৰ্বনৰ মোনায়েম খান সমর্থিত ছাত্র সংগঠন ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন (এনএসএফ) তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্রমবর্ধমান গণ-প্রতিরোধকে বাধা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল। এই সংগঠন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকারীদের মধ্যে তাস ছড়াত, এমনকি শিক্ষকদেরও রেহাই দিত না। একসময় গণজাগরণ তাদের ধ্বংস করে দেয় আর সেই শাসকদেরও পতন ঘটে। যেসব ছাত্র আন্দোলনকারী সামরিক শাসন ও জাতীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ করছিল তারা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এসব ছাত্র

সংগঠনগুলোর মধ্যে প্রথমদিকে ছিল ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। ৬০ দশকের মধ্যেই পাকিস্তানী স্বেরশাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় আরও অনেক সংগঠনের উন্নব ঘটে। দশকের মাঝামাঝি ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হয়ে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এবং ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) হিসেবে কাজ করতে থাকে। ৬০ দশকের শেষ দিকে আরও যোগ হয় বিপুবী ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন ইত্যাদি।

### পাকিস্তানের শেষ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে গণহত্যা শুরু করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয়ী ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যেতে পারলে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের রাজনৈতিক ভারসাম্য পালটে দিত। জেনারেলরা ও পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক শাসক শ্রেণীর অন্যান্য সদস্য শক্তির ভারসাম্যের এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা গণতান্ত্রিক পথ সম্পূর্ণ বর্জন করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং গণহত্যা শুরু করে। এর প্রতিক্রিয়ায় সশস্ত্র প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হয়। ছাত্র আন্দোলনকারীসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের তরঙ্গেরাই এই যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। নয়মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ আর ব্যাপক আত্মত্যাগের পর বাংলাদেশের জন্ম হয়। নতুন দেশ একটা নতুন, সাম্যভিত্তিক ও ন্যায্য সমাজের প্রত্যাশা নিয়ে যাত্রা শুরু করে।

### বাংলাদেশের শুরুর দিকের বছরগুলো

বস্তুত ১৯৭১ সালের বিজয়ের পর থেকেই বাংলাদেশের জনগণের অনেক ধরনের পরাজয়ের অভিজ্ঞতা শুরু হয়। ১৯৭২ সালের শুরু থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান তুলনাইন কর্তৃত ও জনপ্রিয়তা নিয়ে ক্ষমতাসীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা সমাজ ও রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের জন্য কাজে লাগানো হয়নি, সবার অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বরং দিনে দিনে কমেছে। উল্টো আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত গোষ্ঠীগুলো অর্থ, ক্ষমতা ও সম্পদ দখলের জন্য দলের শক্তিকে ব্যবহার করে। গোপন ও প্রকাশ্য কিছু কিছু বামপন্থী গোষ্ঠী ছাড়া প্রকৃত কোনো বিরোধী দলই ছিল না তখন। ক্ষমতাসীন দলের নেতারা কোনো ধরনের বিরোধিতাকেই সহ্য করত না। আর তাই জাতীয় পর্যায়, শ্রমিক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন বা এমনকি ছাত্র সংসদ গুলোতেও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হয়ে নি। ভোটকেন্দ্র দখল ও ব্যালট বাত্র ছিনিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সশস্ত্র হামলার মাধ্যমে সব নির্বাচনকেই নিয়ন্ত্রণ করা হয়। সে সময়ের সরকারি ছাত্র সংগঠন (আরএসপিও) বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই কৌশল নির্বিচারে ব্যবহার করে।

এসবের ফলে সরকারের জনপ্রিয়তায় ধূস নামে, জনগণের মধ্যে ক্ষেত্র বাড়ে যা আবার সরকার মোকাবেলা করে তীব্র দমন-পীড়ন নীতির মাধ্যমে। প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য সরকার বিশেষ বাহিনী গঠন করে। প্রতিবাদী উচ্চকর্ত্ত ও আন্দোলনের বিরুদ্ধে দলের বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনকে ত্রাস সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা হয়। শহর ও গ্রামাঞ্চলে কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শাসক দলের

অবস্থান শক্তিশালী থাকার পরও তারা ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনার জন্য কোনো জায়গাই ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না।

সরকারের কর্তৃত্ববাদিতার প্রতিক্রিয়ায় সমাজে ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। এর মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের ভেতর থেকেই একটা নতুন দল গঠিত হয়; এই নতুন দলের ছাত্র সংগঠন (জাসদ ছাত্রলীগ) খুব কম সময়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্ষমতাসীন দলের সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের সাথে সাথে রাজপথেও এই দুই দলের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘাত নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়। সহিংসতা ও অরাজকতা, অনিচ্ছয়তা আর নিপীড়নের বছরগুলো শেষ হয় খুব খারাপভাবে - প্রথমে জরুরি অবস্থা ঘোষণা (ডিসেম্বর, ১৯৭৪) এবং তারপর একদলীয় শাসন (জানুয়ারি, ১৯৭৫); ১৫ আগস্ট সশস্ত্র সামরিক বাহিনীর কতিপয় সদস্য সপরিবারে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। স্বাধীনতার মাত্র চারবছরের কম সময়েই সামরিক আইন ফিরে আসে, যার ফলে ছাত্র আন্দোলনসহ রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়।

### জিয়া আমল

এরপর অনেক রক্তাক্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন আর দেশের রাষ্ট্রপতি হন। তার সরকার ১৯৭৬ সালের জুলাই থেকে সীমিত পরিসরে রাজনৈতিক কার্যক্রম অনুমোদন দেয়। পলিটিক্যাল পার্টি

রেণ্ডেলিশন (পিপিআর) ছাত্র ও অন্যান্য সংগঠনগুলোর জন্য কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াকে বাধতামূলক করে।

জিয়ার একটি রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠিত হয়, আর জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল (জেসিডি) এর ছাত্র সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্রলীগকে হচ্ছিয়ে ছাত্রদল দ্রুতই প্রধান ছাত্র

সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তেমন কোনো প্রতিরোধ ছিল না যেহেতু আওয়ামী লীগের ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়ার ফলে ছাত্রলীগের প্রভাবও কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে জাসদ ছাত্রলীগও ৭ নভেম্বরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের ফলে ছন্দছাড়া হয়ে পড়ে।

১৯৭২-এর সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও তা ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসন আসার পর এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। এর ফলে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সাথে গণহত্যা ও অন্যান্য যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত দল জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশের রাজনীতির দৃশ্যপটে আবার ফিরে আসার সুযোগ পায়। জামায়াতের ছাত্র সংগঠনও ইসলামী ছাত্র শিবির নামে ফিরে আসে।

১৯৮০-এর দশকের শুরুর দিকে বাংলাদেশে প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলো ছিল ছাত্রলীগ (আওয়ামী লীগের সাথে যুক্ত), জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল (বিএনপি'র সাথে যুক্ত), ছাত্র ইউনিয়ন (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত), জাসদ ছাত্রলীগ (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে যুক্ত), ইসলামী ছাত্র শিবির (জামায়াত-ই-ইসলামীর সাথে যুক্ত), ছাত্র মৈত্রী (ওয়ার্কার্স পার্টির সাথে

যুক্ত), এবং বিপুলী ছাত্র মেট্রী (কমিউনিস্ট লীগের সাথে যুক্ত) ইত্যাদি। দশকের মাঝামাঝি যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন। পরে জাসদ ভেঙে বাসদ হলে তার সঙ্গে যুক্ত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট নামে নতুন সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে।

#### এরশাদ আমল: ঐক্যবন্ধ ছাত্র আন্দোলনের যুগ

১৯৮১ সালের ৩০ মে সেনাবাহিনীর একটি অংশের দ্বারা রাষ্ট্রপতি জিয়া নিহত হন। একবছরের বিভিন্ন অজুহাত ও অভিনয়ের পর সেনাপ্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আসীন ছিলেন, আর ব্যাপক গণ আন্দোলনের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরশাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সময়ই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর কালে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির সবচাইতে উজ্জ্বল অধ্যায়।

শুরুর দিকে সামরিক শাসন কিছু বেসামরিক সমর্থন পায়, তৎকালীন দৈনিক বাংলার বাণী এই সামরিক অভ্যর্থনাকে ‘স্বাগত’ জানায়। কয়েকমাস পরে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ আসে বিপুলী ছাত্র মেট্রীসহ ছোট বামপন্থী সংগঠনের ছাত্রদের কাছ থেকে। তারা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শোগান দেয়, পোস্টার লাগায় আর মিছিল করে এমন সময় যখন এসব কার্যক্রম একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এসব প্রতিবাদের নেতৃত্ব দানকারী কর্মীদের গ্রেফতার করে সংক্ষিপ্ত আদালতে ১৪ বছরের কারাদ- দেওয়া হয়।

এটি সামরিক শাসনের বিধিনিষেধ দমনপীড়ন শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সক্রিয় ভূমিকাকে থামাতে পারে নি। ছোট ছোট উদ্যোগ ও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা ক্রমে “শিক্ষা ভবন ঘেরাও” কর্মসূচিতে উন্নীত হয় ১৯৮৩ সালের ১১ জানুয়ারি। একমাসের মধ্যেই ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশাল প্রতিবাদী কর্মসূচি শাসকদের কাঁপিয়ে দেয়। বিভিন্ন ছাত্র

সংগঠনের ঐক্যবন্ধ মধ্যে ‘ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের’ ব্যানারে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী সামরিক শাসনের অবসানের দাবিতে ঢাকা শহরের প্রধান সড়কগুলোতে নেমে আসে। এই মিছিলে দশহাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী অংশ নেয়, যাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না বা কোনো ছাত্র সংগঠনের সদস্যপদ ছিল না।

সামরিক সরকার মিছিলের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়ে এর উত্তর দেয়। পুলিশের গুলিতে জাফর ও জয়নালসহ কয়েকজন ছাত্র নিহত হন আর অনেকে আহত হন। এরপর সেনাবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তে পড়ে আর ছাত্রছাত্রীদের ওপর এলোপাথাড়ি আক্রমণ করে। এ ঘটনার পর সরকার সব বিশ্ববিদ্যালয় অনিদিষ্টকারের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। এর উত্তরে ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত মধ্যে ১৯৮৩ সালের ১০ মার্চ দশ দফা ঘোষণা করে।<sup>৫</sup>

এভাবে নিজেদের সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে ছাত্র রাজনীতি জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরির জন্য জাতীয় রাজনীতিকে কার্যকরভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে দুটি জোট তৈরি হয়: আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট, এবং বিএনপি'র নেতৃত্বে সাতদলীয় জোট। ১৯৮৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা আরেকটি বিশাল এরশাদ-বিরোধী মিছিল আয়োজন করে, যার ওপর আবার সরকার

হামলা চালায়, এতে সেলিম ও দেলওয়ার নামে দুইজন ছাত্র নিহত হন। এর জবাবে ছাত্র সংগঠনগুলো সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ ধর্মঘট ডাকে ১ মার্চ। ১৯৮৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আরেকটি ছাত্র মিছিলে এরশাদ-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলায় বসুনিয়া নিহত হন। এরশাদ সরকার নিজ সমর্থক ভিত্তি তৈরির জন্য উপজেলা পদ্ধতির প্রবর্তন করে ব্যাপক বাধার মুখেও উপজেলা নির্বাচন আয়োজন করে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধেও ছাত্র কর্মীদের ভূমিকাই ছিলো প্রধান। সরকার অনিদিষ্টকালের জন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে হল ত্যাগে ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করে।

ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান বাধা পেয়ে এরশাদ সরকার ‘নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ’ নামে নতুন একটা ছাত্র সংগঠন তৈরি করে। তার ছাত্র সংগঠনটি (প্রবর্তীতে ‘জাতীয় ছাত্র সমাজ’ নামে পরিচিত) এনএসএফ-এর প্রতিরূপ হিসেবে আবির্ভূত হয়। আগেই বলেছি, এনএসএফ ছিল পাকিস্তান আমলের একটি সশস্ত্র সংগঠন যারা ছাত্রদের আতংকিত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দখলে রাখতে চেষ্টা করেছে। তবে বিভিন্ন ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও জাতীয় ছাত্র সমাজ ছাত্রদের ঐক্যবন্ধ প্রতিরোধের মুখে কোণ্ঠস্বামী হয়ে পড়ে, পরে তা বিলুপ্ত করা হয়।

১৯৮৭ সালের শেষ নাগাদ এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন দেশব্যাপী গণ-জাগরণের রূপ নেয়। এটি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে পুলিশ প্রতিবাদী মিছিলে গুলি করে নূর হোসেনকে হত্যার পর। নূর হোসেন একটি প্রতীকে পরিণত হন যাঁর বুকে পিঠে লেখা ছিল “স্বেরাচার নিপাত যাক” ও “গণতন্ত্র মুক্তি পাক”। ১৯৮৬ সালে আগোষের নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ থেকে (আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের) বেশিরভাগ সংসদ সদস্যের পদত্যাগের পরে এরশাদ সরকার যখন প্রায় ভেঙে পড়েছে তখন সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।

১৯৮৮ সালের শুরুর দিকে আবার সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সবগুলো প্রধান রাজনৈতিক দল এই নির্বাচন বর্জন করে। এর ফলাফল ছিল ভোটারের অংশগ্রহণ ছাড়া একটি অভাবনীয় প্রতারণামূলক নির্বাচন, যার মধ্য দিয়ে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে সংসদ গঠন করা হয়। এই সংসদেই ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৯ সালে সরকারের বিরুদ্ধে ৬০ দিন দেশব্যাপী হরতাল ও ধর্মঘট পালিত হয়। এসব হরতালে জেহাদ হোসেনসহ পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান, ৩৭ জন গুলিবিদ্ধ হন, এবং ১০০ জন আহত হন। ১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর সরকার নিয়োজিত আততায়ীর গুলিতে ডা. মিলন নিহত হলে সারা দেশে প্রতিরোধ বিস্তৃত হয়।

#### ইসলামী ছাত্র শিবির

এই পর্যায়ে জামায়াতের ছাত্র সংগঠনের কর্মকাণ্ডের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতাকারী সবচেয়ে বড় দল ছিল জামায়াত-ই-ইসলামী, আর এর অনেক নেতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে বেশ কয়েকজন নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সামরিক শাসনের কয়েক বছরের মধ্যে রাজনীতিতে জামায়াত ফিরে এসেছিলো। ৮০ দশকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের

মধ্য দিয়েই এটি মূলধারার রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। জামায়াত একদিকে সামরিক শাসক এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র সাথে যুগপৎ আন্দোলনে শরীক হয়ে অন্যদিকে সামরিক শাসনের সুবিধা গ্রহণ করে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশে বড় দুটি জোট তৈরি হয়: আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট, এবং বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে জামায়াত স্বাধীনতাবে অংশ নেয়, কিন্তু উভয় জোটের স্বার্থেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে। সংবাদমাধ্যম এই আন্দোলনকে '১৫-দলীয় জোট, ৭ দলীয় জোট ও জামায়াতের যুগপৎ আন্দোলন' হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকে। কৌশলগতভাবে এটি জামায়াতের জন্য খুবই সুবিধাজনক ছিল, যা মূলধারার রাজনীতিতে তাদের অবস্থান সংহত করার ক্ষেত্রে খুব কার্যকর হয়। এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সময় প্রেফতার, নির্যাতন, নিপীড়ন ও হত্যার অনেক ঘটনা ঘটলেও জামায়াত খুব কমই আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বরং বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের যোগাযোগ সরকার বা বিরোধীদের পক্ষ থেকে কোনো বাধা ছাড়াই তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিস্তৃত করার সুযোগ করে দেয়।

১৯৮০-এর দশকে ইসলামী ছাত্র শিবির জামায়াতের অঙ্গ সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল। ছাত্র শিবিরের সাথে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে অনেক সংঘর্ষ ঘটে। আগ্রেডান্সের মাধ্যমে ছাত্রাবাস দখল করাসহ অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্র শিবির সহিংস পদ্ধা গ্রহণ করে। দুপক্ষেই হতাহত হয় বেশ কয়েকজন ছাত্র। ছাত্র শিবিরের আক্রমণে নিহত ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজের জামিল আক্তার রতন ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কবির। বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের সদস্য কবির নিহত হওয়ার পর অন্যান্য ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্ররা শিবিরের বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ হয় আর জাবি ক্যাম্পাস থেকে শিবিরকে বের করে দেয়। পরবর্তীতে ছাত্র শিবির জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসে অন্তসহ ঢোকার চেষ্টা করলেও সাধারণ ছাত্র বিশেষ করে ছাত্রীদের ব্যাপক বাধার মুখে ব্যর্থ হয়।<sup>১৫</sup>

## ১০ দফা দাবি: জয় পরাজয়ের দলিল

৮০ দশকের শেষে ইসলামী ছাত্র শিবির ছাড়া ২২টি ছাত্র সংগঠন মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র এক' গঠন করে। এরশাদ সরকারের শেষ সময়ে ছাত্রদের এই জোট চূড়ান্ত নির্ধারণী ভূমিকা পালন করেছিলো। এই নতুন মহা ঐক্য এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে ঐক্যবন্ধ নেতৃত্ব দেয় আর প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের ঐক্যবন্ধ রাখতে ভূমিকা পালন করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পতন হয়। 'সর্বদলীয় ছাত্র এক' ঐক্যবন্ধভাবে ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ৮ দল, বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দল ও বামপন্থী ৫ দল ছাত্রসংগঠনগুলোর ১০ দফা দাবির সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করে। এরশাদের পতনের পর এই দাবিনামা চূড়ান্ত হয়। তবে এখন পর্যন্ত এই দাবিনামার বেশিরভাগ দাবি শুধু অপূর্ণ নয়, বরং উল্টোযাত্রাই আমরা দেখতে পাই। এই দাবিনামার সারাংশ নিম্নরূপ:

১. (ক) সব পর্যায়ে সর্বজনীন, গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতির প্রচলন করতে হবে। বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করতে হবে। টিফিন, পোশাক ও বৃত্তি নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার কোনো বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করা যাবে না। (খ) সব বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বায়ত্তশাসিত, সহিংসতা-মুক্ত ও গণতান্ত্রিক। আচার্যকে অবশ্যই একজন শিক্ষাবিদ হতে হবে। (গ)

শিক্ষা খাতের ব্যয় জিডিপি'র ৮% ও জাতীয় বাজেটের ২৫%-এ উন্নীত করতে হবে।

২. (ক) টিউশন ফি'র বৃদ্ধি রদ করতে হবে। (খ) শিক্ষায় কোনো বৈষম্য করা যাবে না। যাতায়াতে ছাত্রদের ছাড় দিতে হবে। (গ) ছাত্রদের জন্য খন্দকালীন চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। (ঘ) প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সরকারকে পাঠ্যবই সরবরাহ করতে হবে। (ঙ) সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা চালু করতে হবে। (চ) খেলা, শিল্প, গান ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করতে হবে। (ছ) যোগ্য শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে হবে আর তাদের বেতন বাড়াতে হবে।

৩. হত্যা, অবৈধ শাসন ও দুর্বীলির জন্য জেনারেল এরশাদ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ব্যবসায়ী ও আমলাদের বিচার করতে হবে। তাদের অবৈধ সম্পত্তি আটক করতে হবে।

৪. প্রেসের স্বাধীনতা, মতামত ও বিচার বিভাগসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সংবিধানের গণতন্ত্রায়ণ করতে হবে। অগণতান্ত্রিক নিপীড়নমূলক আইন বাতিল করতে হবে।

৫. রেশনিং ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করতে হবে। স্বাস্থ্য খাতের বেসরকারিকরণ করা যাবে না।

৬. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমূলত রাখার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করা যাবে না। রাষ্ট্রকে হতে হবে ধর্ম-নিরপেক্ষ।

৭. (ক) বিদেশী রাষ্ট্র ও কোম্পানির সাথে সব ধরনের অসম ও গণ-বিরোধী চুক্তি বাতিল করতে হবে। হরিপুর তেলক্ষেত্রের লীজ চুক্তি বাতিল করতে হবে। (খ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণ করে কর্মীদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষপে'র পাঁচদফা, ২৭ কৃষক ও কৃষিশ্রমিক সংগঠনের দশদফা বাস্তবায়ন করতে হবে। (গ) নারী ও পুরুষের সমান অধিকার বিষয়ে নারী সংগঠনগুলোর দাবি মানতে হবে।

৮. (ক) চলচিত্র, মঞ্চনাটক ও প্রকাশনা শিল্পকে প্রতিপোষণ করতে হবে। সব নিষেধাজ্ঞা ও সেন্সরশিপ তুলে নিতে হবে। সাংস্কৃতিক কমিশনের প্রতিবেদন বাতিল করতে হবে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের দাবি পূরণ করতে হবে। (খ) দেহব্যবসা শেষ করতে হবে আর যৌনকর্মীদের পুনর্বাসন করতে হবে।

৯. অর্পিত (শক্র) সম্পত্তি আইন বাতিল করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুদের ওপর সামরিক বাহিনীর নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে আর রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। সকল নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুর স্বীকৃতি দিতে হবে আর স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ অধিকারসহ তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

১০. পররাষ্ট্র নীতি হতে হবে স্বাধীন ও জোটের বাইরে, এবং সম্রাজ্যবাদের ওপর অধীন হবে না। সম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আর আগ্রাসনের বিরোধিতা করতে হবে। জিওনবাদ, নব্য-গুপ্তবিশিক্তবাদ, নেরাজ্যবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা করতে হবে। (খ) নিজস্ব জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের সাথে ফারাক্কা, তালপত্তি ও করিডোর ইস্যুর সমাধান করতে হবে।

**১৯৯১ পরবর্তী শিক্ষান্তর এবং ছাত্র আন্দোলনের নতুন গঠন**  
ছাত্র সংগঠনগুলোর এক্য ১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের অল্পকিছুদিনের মধ্যেই অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশ 'নির্বাচিত' সরকারের অধীনে শাসিত হয়ে আসছে। হয় আওয়ামী লীগ (এবং জোট) অথবা বিএনপি (এবং জোট) এসব সরকারের নেতৃত্বে ছিল। এর প্রত্যেকটি পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র

সংগঠনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্তৃত্ব বিস্তার করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দখল করার জন্য এমনকি তারা বহুধরনের সহিংস উপায়ও ব্যবহার করে। তার ফলে দেখা যায় সরকালে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রাবাসের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সন্তাস, চাঁদাবাজীতে নেতৃত্ব দিয়েছে।

কাজেই আমরা দেখি, ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কোথাও কোথাও ছাত্র শিবিরও নিয়ন্ত্রণ করত। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এই নিয়ন্ত্রণ ছাত্রলীগের হাতে চলে যায়। ছাত্রদল ও শিবির আবার নিয়ন্ত্রণকারী অবস্থানে চলে আসে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত। এই ধারাবাহিকতায় দুইবছরের একটা হেদ পড়ে সেনাবাহিনী-সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কারণে। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জেতার পর ছাত্রলীগ আবারও ক্ষমতায় চলে আসে। সময়ের সাথে সাথে এই সংগঠনগুলোর নিজ নিজ ক্ষমতাকালে কর্তৃত্ব বেড়ে গেছে। সর্বশেষ পর্যায়ে এরা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

১৯৯০ সালে ১০ দফা দাবির প্রতি একাত্তা ঘোষণা করবার পর এর পুরো বিপরীত যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছে ৯০ পরবর্তী সরকারগুলো। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ভয়ংকর আকার নিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের কৌশলপত্র, এভির উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পসহ নানা ঝণনির্ভর প্রকল্প বাস্তবায়ন এদেশের শিক্ষা বণিকদের জন্য শিক্ষাখাত উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয়ে উইকেন্ড, ইভনিং নামে বাণিজ্যিক তৎপরতা, ফি বৃদ্ধি দিনে দিনে বাড়ছে, স্কুল কলেজ ক্ষেত্রেও বাণিজ্য ও শিক্ষার ধ্বনি একই সাথে বাড়ছে। অন্যদিকে একইসময়কালে শিক্ষাঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ আরও সংকুচিত হয়েছে। ১৯৯১ থেকে কোথাও আর কোনো ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সরকারি দলের একাধিপত্য হলে হলে শিক্ষার্থীদের জীবনকে বিভীষিকাময় করে তুলেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সরকারি দল ও সরকারি ছাত্র সংগঠনের সাথে ঐক্যবন্ধভাবে ভিন্নমত প্রকাশের পথে বিস্মৃষ্টির নানা পথ নিয়েছে, নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছবির হাট, টিএসসি, শহীদ মিনার নিয়ন্ত্রিত করা এরই অংশ। প্রশঞ্চিস, ভর্তি বাণিজ্য, নিয়োগে অনিয়ম ও নিয়োগ বাণিজ্য বিস্তারের সাথে এই সন্তাসী আবহাওয়া প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খবরের কাগজের অসংখ্য প্রতিবেদন দেখিয়েছে কিভাবে ভূমি ও দোকান দখল, দরপত্র ছিনতাই, আর বিরোধিতাকারীদের দমন করতে ভাড়াটে মাস্তান হিসেবে সরকারি ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা কাজ করছে। কীভাবে এমনকি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বেতন বাড়ানো বা শিক্ষা-বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীদেরকে দমন করার জন্য এই সংগঠনকে ব্যবহার করেছে।<sup>৭</sup> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্তুর শিক্ষার্থীদের দমন করতে মিথ্যা মামলা দিয়েছে প্রশাসন, ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দিয়েছে আন্দোলনকারীদের ওপর এরকম উদাহরণ অনেক। এসবের বিনিময়ে শাসক সংগঠনের নেতা ও কর্মীরা যা চায় তা-ই করার বিশেষ অধিকার অর্জন করে। এসবের মধ্যে ছিনতাই, লুট, যৌন হয়রানির পাশাপাশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পরিবহন ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় সবই অত্বৃত। ১লা বৈশাখে নববর্ষের উৎসবে যৌন হয়রানির সিসিটিভি ছবি থাকার পরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তা ধামাচাপা দেয়ায় প্রমাণিত হয় যে এতে ছাত্রলীগসহ সরকারি দলের লোকজনই জড়িত ছিলো। খুন, চাপাতিসহ আগ্নেয়ান্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে প্রতিপক্ষের ওপর হামলা, আসসৃষ্টিতে তাদের ভূমিকা বছবার খবর হলেও এর কোনো

পরিবর্তন হয়নি। বিশ্বজিৎ হত্যার ভিডিও থাকায় সরকার ছাত্রলীগের নেতাকর্মীর দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারেনি, প্রবল জনমতের কারণে বিচারও হয়েছে। কিন্তু প্রধান আসামীরা সফলভাবে প্লাটক থেকেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জুবায়ের হত্যার ক্ষেত্রেও ঘটনা একই। অর্থ সম্পদ ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সংগঠনেই বহু খুন্দুনিতে ছাত্রলীগের ভূমিকা নিয়েও অনেক খবর প্রকাশিত হয়েছে।

### নতুন সামাজিক গঠন

প্রকৃতপক্ষে সরকারি ছাত্র সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ এতই সর্বব্যাপী যে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের পক্ষে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের অপকর্ম প্রতিরোধ করার সুযোগ খুবই সংকুচিত। প্রতিবাদী বাম ছাত্র সংগঠনগুলো সার্বক্ষণিক চাপ ও নিরাপত্তাইনতার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়। এরকম পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের ক্ষেত্রেও নতুন ধরনের সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নত ঘটে। এটি বিশেষভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে।

ক্যাম্পাসে যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের প্রতিবাদ করার জন্য ১৯৯৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি নতুন জোট তৈরি হয়। যেহেতু যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তরা ছিল সরকারি ছাত্র সংগঠনের নেতা, বাম ছাত্র সংগঠনের পক্ষে এককভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করার অবস্থা ছিল না। তবে তাদের সক্রিয় ভূমিকায় গড়ে উঠা প্রতিবাদে সংগঠনের বাইরের শিক্ষার্থী বিশেষত নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এতই কার্যকর ছিল যে তাদের উচ্চকাষ্ঠ প্রতিবাদকে সরকারি ছাত্র সংগঠন হ্যাকি ও ভীতি দিয়ে চুপ করাতে পারে নি। এই আন্দোলনে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোর ধারাবাহিক অংশগ্রহণ থাকলেও মূল শক্তি আসে সংগঠন বহির্ভূত সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে।<sup>৮</sup> আন্দোলনের বিষয়ে ছাত্র আন্দোলনে নতুন মাত্রা দেয়।

এই আন্দোলনের সময় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে এই নতুন গঠনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমি নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করি: '(১) এই প্রথমবার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন তৈরি হয়েছে আর দীর্ঘ সময় টিকে আছে। (২) এই আন্দোলনে সাধারণ শিক্ষার্থী বিশেষকরে নারী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ব্যাপক ও অভূতপূর্ব। (৩) এই আন্দোলন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের নিপীড়ক ভূমিকাকে চ্যালেঞ্জ করে বেড়ে উঠেছে যেখানে অন্য কোনো ছাত্র সংগঠন তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ তৈরি করবার মতো অবস্থানে ছিল না। (৪) এই আন্দোলন অতীতের ক্ষমতা বিরোধী আন্দোলন থেকেও শক্তি নিয়েছে। (৫) এই আন্দোলন একইসাথে 'স্বতঃক্ষুর্ত' ও 'সামাজিক আন্দোলন'-এর রাজনৈতিক তাৎপর্য এবং বর্তমানের বাম সংগঠনগুলোর কর্মধারা পর্যালোচনার তাগিদ উপস্থিত করছে।'<sup>৯</sup>

পরবর্তী বছরগুলোতে বিভিন্ন নিপীড়ন ও অবিচারের বিরুদ্ধে অন্যান্য ক্যাম্পাসেও একই ধরনের আন্দোলন গড়ে উঠে। এর মধ্যে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে (১৯৯৮-৯), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি ছাত্র সংগঠনের সহিংসতা ও ত্রাস সঞ্চারের বিরুদ্ধে (২০০০), এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী হলে পুলিশের হামলার বিরুদ্ধে (২০০২) আন্দোলন। এসব আন্দোলন ছাত্র রাজনীতির ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। পরবর্তী দশকে সাধারণ শিক্ষার্থী ও বামপন্থী সংগঠনের জোটের মাধ্যমে টিউশন ফি বাড়ানোর বিরুদ্ধেও আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বিরোধী আন্দোলনের ফলে জনমত শক্তি পায় এবং তার কিছু উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে হাইকোর্টের

নির্দেশনা এবং প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্চের কমিশন প্রবর্তিত ‘যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা’ গ্রহণ।

সর্বজনের স্বার্থ ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে গত দুদশকে গড়ে উঠা জাতীয় আন্দোলনে তরুণ শিক্ষার্থী আন্দোলনকারীরা অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। নির্দিষ্ট দাবি ও কর্মসূচিসহ এই আন্দোলনের ভিত্তি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মনোযোগ দাবি করে। যদিও অনেক বামপন্থী দল বৃহত্তর এই মধ্যে সক্রিয়, এটি কোনো রাজনৈতিক দল-কেন্দ্রিক আন্দোলন নয়। বরং এটি দলবহুভূত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোকে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে গঠিত এই জোট বহুজাতিক কোম্পানির সাথে জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি, মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টাল কর্তৃক মাণুরছড়ায় বিফেরণ, এবং গ্যাস রঙ্গনির জন্য

বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর উদ্যোগের প্রতিবাদ করার জন্য গঠিত হয়। ক্রমে আরও বিভিন্ন বিষয় বিশেষত বন্দর, বিদ্যুৎ ও পরে ফুলবাড়ী নিয়ে ব্যাপক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এর কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়। এর নাম বিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় ‘তেল গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি’। এসব বিষয়ে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় গত ৭ বছর ধরে ব্যাপক জনভিত্তি লাভ করেছে সুন্দরবন রক্ষা আন্দোলন। ব্যাপক অংশগ্রহণ ও জন-সমর্থনের সাথে এই জাতীয় কমিটি দেশব্যাপী অনেক কর্মসূচি পালন করেছে, আর প্রত্যেক পর্যায়ে দলীয় ও নির্দলীয় উভয় তরুণ কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

প্রবর্তী সারণিতে প্রত্যেক পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র আন্দোলনের ধরনের সম্পর্ক দেখা যায়।

সারণি ২: ছাত্র রাজনীতি ও সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় (১৯৭২-২০১৬)

রাষ্ট্র ও নীতি	ছাত্র আন্দোলন	সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়
১৯৭২: চারটি নীতিসহ নতুন সংবিধান: গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। ১৯৭৩-৪: বাংলাদেশ ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে। : পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে যোগসাজশ ছিল কিন্তু যুদ্ধাপরাধের নির্দিষ্ট অভিযোগ নেই এমন ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা। : বিভিন্ন পর্যায়ে রাজাকার আমলা, সেনা কর্মকর্তাদের পুনর্বাসন। : রক্ষীবাহিনী নামে একটি নতুন আধা-সামরিক বাহিনী গঠন। : বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সদস্য। ১৯৭৪: জরুরি অবস্থা ঘোষণা	১৯৭২-৭৩: প্রধান ছাত্র সংগঠন: ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন-এর জোট গঠন। ১ জানুয়ারি ১৯৭৩: দুইজন ইউনিয়ন কর্মী মতিউল ও কাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মিছিলে পুলিশের গুলিতে নিহত। ১৯৭৩-৭৫: জাসদ ছাত্রলীগ গঠন, ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের প্রতি প্রধান হ্যাকি হয়ে উঠা। : বিরোধীদের ওপর নিপীড়ন, অন্যান্যদের মধ্যে তরুণ কর্মীদের হত্যা ও নির্বোজ। : সরকার-সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে সহিংসতা।	১৯৭২-৭৩: শেখ মুজিবুর রহমানের বিপুল জনপ্রিয়তা। ক্রমে তার ধ্বনি এবং আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্যতায় ক্ষয়। : বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর ‘উন্নয়ন’ কার্যক্রম শুরু। : সন্ত্রাস ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি।
১৯৭৫: জানুয়ারি: একদলীয় শাসন। আগস্ট: রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার হত্যা। সামরিক আইন জারি। : রাষ্ট্রনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল। : ধর্মভিত্তিক রাজনীতির নিষেধাজ্ঞা অপসারণ। : ধারাবাহিক রক্তাক্ত সংঘর্ষ ও ‘সিপাহি বিদ্রোহের’ পর জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা দখল। ১৯৭৮: রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়ার বিএনপি গঠন। : জামাত-এর নেতা ও শীর্ষ যুদ্ধাপরাধী গোলাম আয়মকে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দান। ১৯৮১: রাষ্ট্রপতি জিয়াকে হত্যা।		১৯৭৪: বড় আকারের দুর্ভিক্ষের ফলে বিভিন্ন হিসাবে প্রায় ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু। সরকারি হিসাবে ৬৭,০০০। ১৯৭৫: পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের আরও উন্নয়ন।
১৯৮২: সেনাবাহিনী প্রধান এইচ এম এরশাদের সামরিক আইন জারি। ১৯৮২-৯০: ব্যবসা ও রাজনীতিতে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে ধর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি। ১৯৮৬: এরশাদের দল জাতীয় পার্টি গঠন। : জরুরি অবস্থা ঘোষণা। : হরিপুর তেল ক্ষেত্রের জন্য সিমিটার চুক্তি।	১৯৮৩-৮৪: সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদের ব্যাপক প্রতিরোধ। ১৯৮০'-র দশক: সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্রদের জোট গঠন। : হরিপুর তেলক্ষেত্রে নিয়ে সিমিটার চুক্তির বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন। ১৯৮৫: জাতীয় পার্টির ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্র সমাজ গঠন। এই সংগঠন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আস সৃষ্টি করে। ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ। ১৯৮০-র দশক: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ঘাঁটি স্থাপন। অন্য সংগঠন বিশেষকরে বাম কর্মীদের সাথে সংঘাত।	১৯৮৩-৮৪: শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন। ১৯৮২-৮৯: বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর কাঠামোগত সমস্য কর্মসূচি। রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটপাট, অপরাধ, কালো টাকার দোরাত্য। : বি-শিল্পায়ন। : উৎপাদন খাতে স্থিরতা। বেকারত্ব বৃদ্ধি।

রাষ্ট্র ও নীতি	ছাত্র আন্দোলন	সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়
১৯৮৮: সব রাজনৈতিক দলের বর্জনের মধ্য দিয়ে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত। ভোটারদের উপস্থিতি প্রায় শূন্য। : এই সংসদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা।	১৯৮৯: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে বিতাড়ন।	১৯৮৭-৮৮: দেশব্যাপী শক্তিশালী গণ আন্দোলন। কৃষক ও ক্ষেত্রমজুর আন্দোলন।
১৯৯০: ডিসেম্বর: দীর্ঘ আটবছরের গণ-প্রতিবাদের পর সামরিক শাসকের পদত্যাগ।	১৯৯০: প্রায় সব ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণে '২২ ছাত্র সংগঠন'-এর শক্তিশালী জোট তৈরি।	১৯৯০: দেশব্যাপী স্বেচ্ছাচারবিরোধী আন্দোলন তীব্র হওয়া।
১৯৯১: নির্বাচনে বিএনপি'র জয়লাভ। জামাতের সমর্থনে সরকার গঠন। : জামায়াত-ই-ইসলামীর আমির হিসেবে গোলাম আয়মের আত্মপ্রকাশ।	সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের দ্রুত নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ। ১৯৯২: দেশব্যাপী যুদ্ধাপরাধের বিচার আন্দোলন শুরু। তরুণ শিক্ষার্থীরা এর প্রধান অংশগ্রহণকারী।	১৯৯২: যুদ্ধাপরাধের বিরুদ্ধে গণআদালত, আন্দোলন তীব্র। বাবরী মসজিদ ভাঙা কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মিছিলের শ্লোগান-'দুইদেশের দুই খুনি, গোলাম আজম আদভানি'।
১৯৯২: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস। লাভজনক খাত হিসেবে দ্রুত প্রসার। ১৯৯৩: বহুজাতিক কোম্পানির সাথে তেল-গ্যাস ব্রক নিয়ে প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) স্বাক্ষর শুরু। ১৯৯৩-৯৪: প্রশাসনের ছেতাহায় নারী, লেখক, বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে ফতোয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি।	ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের আধিপত্য বিস্তার।	১৯৯৩-৯৪: গ্যাট চুক্তি। ৫,০০০ কারখানা বন্ধ। এক লাখ কর্মী ছাঁটাই। ১৯৯৬ ...: বিদ্যুৎ খাত ব্যক্তিখাতে দেবার আইন।
১৯৯৪-৯৫: বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের সমরোতা ও যুগপৎ আন্দোলন।		
১৯৯৬ ...: ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ।	সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দ্রুত নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ।	১৯৯৬ ...: পুরানো অর্থনৈতিক নীতি অব্যাহত।
১৯৯৬ ...: ক্ষমতায় ধর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি। বিএনপি ও জামায়াতের জোট। ১৯৯৭ ...: আরও পিএসসি স্বাক্ষরিত। বেসরকারিকরণ অব্যাহত। ১৯৯৯: র্যালি, ধর্মীয় স্থান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে সন্তানী হামলা শুরু।	১৯৯৮...: বিভিন্ন ব্যানারে শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক ভূমিকা দৃশ্যমান। ধর্ষণবিরোধীসহ বিভিন্ন আন্দোলনে শরীক।	১৯৯৭ ...: মাগুরছড়ায় ইউনোকাল কর্তৃত্বীন গ্যাসফিল্টে বিস্ফোরণ। বাংলাদেশের বিপুল ক্ষতি।
২০০১-২০০৬: জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের সাথে জোটবদ্ধভাবে বিএনপি ক্ষমতায়। : যুক্তরাষ্ট্রের সাথে 'সন্ত্রাসবিরোধী' পদক্ষেপের জন্য 'গোপন চুক্তি'। : সন্ত্রাসী আক্রমণ অব্যাহত। : সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপের নামে রাষ্ট্রীয় হত্যায়জ্ঞ শুরু।  : বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত কাঠামোয় ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র। বেতন ফি বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয়হাসের সুপারিশ।	২০০৩-৪ ...: আওয়ামী লীগ ও বিএনপি জোটের বাইরের ছাত্র সংগঠনগুলোর সক্রিয়ভাবে তেল-গ্যাস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত লংমার্চসহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ২০০৬: ফুলবাড়ী আন্দোলনে বাম সংগঠনসহ শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা।	২০০১ ...: বৃহৎ সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান বন্ধ। ব্যাংক, সেবা খাতের আরও বেসরকারিকরণ। : লুটপাট, দখল, বহুজাতিক কোম্পানির সাথে ভয়াবহ চুক্তি অব্যাহত। ২০০২: নতুন সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে বিচার-বহির্ভূত হত্যা। ২০০৩: প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে জনস্বার্থবিরোধী চুক্তির বিরুদ্ধে লং মার্চ ও অন্যান্য কর্মসূচি। ২০০৫: টেংরাটিলা গ্যাস ক্ষেত্রে বিস্ফোরণ। ২০০৬: বহুজাতিক কোম্পানির সাথে অসম চুক্তি এবং ভয়াবহ ফুলবাড়ী উন্মুক্ত কয়লা খনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে গণজাগরণ। গণঅভ্যুত্থানের মুখে সরকার ও জনগণের মধ্যে ফুলবাড়ী চুক্তি স্বাক্ষর।
২০০৭-২০০৮: সেনা-সমর্থিত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায়। অনেক দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীকে জেলে পাঠানো। কিন্তু নিপীড়ন, ব্র্যাকমেইলিং ও অপহরণের প্রসার।	২০০৭: সেনা কর্মকর্তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছাত্র বিস্ফোরণ। শিক্ষকদের ও প্রতিবাদী সংহতি কর্মসূচি।	ভৌতির পরিবেশ। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারিকরণের জন্য আরও নীতিগত সংস্কার। গার্মেন্টস ও পাটশ্রমিকদের আন্দোলন।
২০০৮ ডিসেম্বর: সাধারণ নির্বাচন। আওয়ামী লীগ জোটের ক্ষমতা গ্রহণ। ২০১০.. : যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু। : শিক্ষার ধর্মীয়করণ ও বাণিজ্যিকীকরণের আরও বিস্তার। : সংবিধান অধিকতর সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্যোত্তী ও অগণতাত্ত্বিক।	ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন। : তরুণ ও বামপন্থীরা সুন্দরবন ও শাহবাগ আন্দোলনে সক্রিয়। ২০১৫..: কৌশলপত্র বাতিল ও ছাত্র সংসদের দাবিতে, সন্ত্রাস ও দখলদারিয়ের বিরুদ্ধে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোসহ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন।	২০০৯....: বিচার-বহির্ভূত হত্যা ও গুম অব্যাহত। ...নদী পাহাড় বন দখল দূষণ বৃদ্ধি। ২০১৫..: সরকার হেফাজত সমরোতা। শিক্ষার সর্বব্যাপী বাণিজ্যিকীকরণ। প্রশ্নফাঁস, ভর্তিবাণিজ্য...

## উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে তরুণ শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তায় বিভিন্ন ধরন আছে। ‘ছাত্র রাজনীতি’র দুটি প্রধান ধারা: একটি ধারা ক্ষমতাসীন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর রাজনীতি এবং সামাজিক সম্পর্কের কাছাকাছি থাকে, আর অন্যটি তাদের বদলানোর জন্য লড়াই করে। প্রথম ধারাটি শাসক ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সবচাইতে উলঙ্ঘন্ত প্রকাশিত, যা ক্ষমতাসীন দলকে প্রতিনিধিত্ব করে, আর দখলকারী, লুটেরা ও দুর্নৈতিবাজসহ রাষ্ট্রিয়ত্বের ভাড়াটে সৈনিকদের মতো ভূমিকা পালন করে। এই ধারা তরুণদের শক্তির অবক্ষয়ের দিকে নির্দেশ করে। দ্বিতীয় ধারাটি দৃঢ়ভাবে সংগঠিত নয়, পৃষ্ঠপোষণ পায় না, রাষ্ট্র বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন বিরুদ্ধ পক্ষ হিসেবে বিবেচনা করে, সেই কারণে পুলিশসহ ক্ষমতার নানা খুঁটির বৈরী আচরণ পায়। কিন্তু এই দ্বিতীয় ধারাটিই সমাজের নতুন জন্মের শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও চর্চা থেকে এখন অনেক দূরে। শাসক ছাত্র সংগঠন যার প্রতিনিধিত্ব করে তা আসলে একধরনের জমিদারি ব্যবস্থা, যা বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা আইনি প্রক্রিয়াকে অগ্রহ করে। এসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সুস্থ বিকাশের জন্য ক্ষেত্র তৈরি এখনো একটি স্বপ্ন আর অব্যাহত লড়াইয়ের বিষয়। অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রত্যেক সরকারের সময় শাসক ছাত্র সংগঠন আর রাষ্ট্রের বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঠিকই সরব হয়েছে শিক্ষার্থীরা। ‘সাধারণ ছাত্রদের ঐক্য’, ‘নিপীড়নের বিরুদ্ধে আমরা’, ‘নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’, ‘নিপীড়ন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ’, ‘বেতন-ফি বৃদ্ধিবিরোধী ছাত্র ঐক্য’, ‘ভ্যাট নাই’ ‘ধর্ষণ প্রতিরোধ মঞ্চ’, ‘সুন্দরবনের জন্য আমরা’, ‘জাতীয় সম্পদ রক্ষা তরুণ সমাজ’, ‘ছাত্র সংসদের দাবিতে ছাত্রসমাজ’ ইত্যাদি ব্যানারের অধীনে নতুন নতুন মঞ্চ দেখা গেছে গত কয়েকবছরে। যদিও এসব নতুন মঞ্চের কোনো স্থায়ী সাংগঠনিক কাঠামো নেই, তবুও শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য অংশকে তাদের আকর্ষণ করার ক্ষমতা প্রমাণিত। বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও বাম সংগঠনগুলোর চেষ্টা অব্যাহত আছে। বলাই বাহ্য্য, প্রতিবাদের এই ধারাই বাংলাদেশ সমাজের জন্য আশার উৎস।

**আনু মুহাম্মদ:** শিক্ষক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমেইল: anu@juniv.edu

লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইমতিয়াজ আহমেদ ও ইফতিখার ইকবাল সম্পাদিত ইউনিভার্সিটি অব ঢাকা: মেকিৎ, আনমেকিৎ রিমেকিৎ, গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ হিসেবে (প্রথম প্রকাশন, ২০১৬)। বর্তমান প্রবন্ধটি এর অনুবাদের পরিমার্জিত ও পুনর্বিন্যস্ত সংস্করণ। অনুবাদ করেছেন: শাহজাদা এম. আকরাম।

### তথ্যসূত্র:

১. উচ্চ প্রদৰ্শন সত্ত্বেও রানা প্রাজা ধসের মতো ঘটনা এই রণ্ধনিমুখী খাতের ঝুঁকি সামনে নিয়ে আসে। কমপক্ষে ১১৩৪ জন নিহত হওয়ার পেছনে দায়ী কারখানাগুলোর অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ। এই ধসের ওপর আলোচনার জন্য দেখুন আনু মুহাম্মদ, “বাংলাদেশ আরএমজি: গ্লোবাল চেইন অব প্রফিট অ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন”, [www.opinion.bdnews24.com/bangladesh-rmg-global-chain-of-profit-and-deprivation/](http://www.opinion.bdnews24.com/bangladesh-rmg-global-chain-of-profit-and-deprivation/)। এই খাতের সংক্ষার ও গতি-প্রকৃতির ওপর বিশ্লেষণের জন্য দেখুন আনু মুহাম্মদ, “ওয়েলথ অ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন: রেডিমেড গার্মেন্টস ইন বাংলাদেশ”, ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি (ইপিডব্লিউ), XLVI, ৩৪ (২০১১)।
২. আনু মুহাম্মদ, “ওয়েলথ অ্যান্ড ডিপ্রাইভেশন”।
৩. ডেভিড হার্ডি, দি এনিগ্মা অব ক্যাপিটাল অ্যান্ড ক্রাইসেস অব ক্যাপিটালিজম (প্রোফাইল বুকস, ২০১১), পৃ. ৪০-৫৭।
৪. আনু মুহাম্মদ, “ঢাকা মহানগরীর পেশা: গতি ও বৈপরিত্য”, বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিমুখ (ঢাকা: শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০০)।
৫. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন- আনু মুহাম্মদ, “ছাত্রসমাজ, ছাত্র আন্দোলন এবং বিপুলী রাজনীতি”, রাষ্ট্র ও রাজনীতির দুই দশক (ঢাকা: সন্দেশ, ২০০০)।
৬. ১৯৮০-এর দশক থেকে ইসলামী ছাত্র শিবির ও জামায়াত-ই-ইসলামীর সহিংস কর্মকাণ্ড বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয় ও বিভিন্ন ঘটনার ওপর লিখিত প্রবন্ধের সংকলনের জন্য দেখুন আনু মুহাম্মদ, ধর্ম, রাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন (ঢাকা: চার্বাক, ১৯৯৪)।
৭. একটি প্রতিষ্ঠানে এর প্রামাণ্য বিবরণ পেতে দেখুন: বর্ধিত ফি বিরোধী ছাত্র আন্দোলন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১০-এ সংঘটিত আন্দোলন নিয়ে প্রকাশনা-সংকলন।
৮. এই আন্দোলনের ওপর প্রকাশিত খবরের কাগজের প্রতিবেদন, প্রবন্ধ ও ছবির একটি সংকলন পরবর্তী বছরে প্রকাশিত হয়। খুব তাড়াতাড়ি এটি অন্যান্য জায়গায় নিপীড়ন-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে উদ্বোধন উৎস হয়ে যায়। দেখুন অশুচি, ধর্ষণবিরোধী ছাত্রী আন্দোলন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯৮তে সংঘটিত আন্দোলন নিয়ে প্রকাশনা-সংকলন (১৯৯৯)।
৯. আনু মুহাম্মদ, “জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন: ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক ভূমিকার নতুন মাত্রা”, রাষ্ট্র ও রাজনীতির দুই দশক (ঢাকা: সন্দেশ, ২০০০)।

